Rs. 2.00

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য ঃ ২ টাকা

মাসিক

Vol : XIV Issue : VII, 15th, October, 2024 ১লা আশ্বিন, ১৪৩১, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

সম্পাদকীয়

গত সংখ্যায় পত্রিকার এই স্থানটি আমরা শূন্য রেখেছিলাম। কিন্তু তিলোত্তমা তো আজও বিচার পেল না। তাই শরতের আগমনেও চিরাচরিতভাবে আনন্দে মেতে উঠতে পারছি না।

গত রবিবার, ২৯/০৯/২৪, সন্ধ্যায় আর জি কর-এর ঘটনার প্রতিবাদে আমরা এক গণকনভেনশনের আয়োজন করেছিলাম। সেখানে রাজনৈতিক দলগুলো ব্যতীত, সমাজের বিভিন্ন স্তরের গণসংগঠনগুলো এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের মতামত জানিয়ে অবিলম্বে বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে তথাগত দাস বর্তমান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত বর্ণনা করে নাগরিক সমাজের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। ডাঃ অরিন্দম ভট্টাচার্য, বাঙুর হাসপাতালের প্রাক্তন অধিকর্তা, কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে থ্রেট কালচারের স্বরূপ উদঘাটন করেন।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য সর্বত্রই আজ বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ। অনেকেই নির্লজ্জভাবে প্রশ্ন করছেন, আগে কেন এই ঘটনাগুলো নিয়ে আমাদের বিবেক জাগ্রত হয়নি? গত এক দশকের দুর্নীতির ঘটনায় সম্মিলিত ক্ষোভ এক অসহনীয় বিন্দুতে পৌঁছে এই অভাবনীয় আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। এখনই তো আদর্শের কথা, নীতির কথা আরো বেশি করে বলা দরকার। কিন্তু বলতে গিয়ে গলা কেঁপে যাচ্ছে। এতদিন যা জেনে এসেছি, আদর্শ বলে বিশ্বাস করেছি তা কী ভুল! আত্মত্যাগী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, সমাজ সংস্কারকরা, হরিদাস মালাকারের মতো সর্বত্যাগী কমিউনিস্ট নেতারা কী এমন দেশ চেয়েছিলেন? কিন্তু না, হতাশার কারণ নেই। আশার আলো দেখাচ্ছে জুনিয়র ডাক্তাররা এবং জাগ্রত নাগরিক সমাজের বিবেক। প্রবীণদের তরফ থেকে তাদের প্রণাম জানাই।

বিদ্যাসাগর ও মানবাধিকার

গৌতম রায়চৌধুরী

> 'আমাদের দেশের লোকেরা একদিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না করে থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ব গুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড়ো পরিচয় সেইটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীর দ্বারা লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন।' (১)

রবীন্দ্রনাথ যাকে পৌরুষ বলেছেন, সবাই 'তিরস্করণী' (দয়া-দাক্ষিণ্য)-এর দ্বারা যাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন, বিনয় ঘোষ তাকে 'মানবচেতনা' বলে অভিহিত করেছেন।

> '... দয়াদক্ষিণ্য বদান্যতা মহানুভবতা মাতৃভক্তি সব কটি মানবচরিত্রের মহৎ গুণ হলেও, ব্যক্তিচরিত্রের উপাদান হিসেবে তার বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক মূল্য নেই। ...কেবল এই গুণগুলির সমাবেশের জন্য বিদ্যাসাগরের মতো ঐতিহাসিক চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হয়নি। তাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ হলো এই হিউম্যানিজ্‌ম, এই মানবতন্ময়তা, এই মানবাচ্ছন্ন চেতনা। মানব-অতীত ও মানব-ব্যতীত সমস্ত চেতনার উপরে ছিল তাঁর মানবচেতনা। এই চেতনাই ঐতিহাসিক।' (২)

মানুষের ইতিহাসে আদি-অনন্তকাল থেকেই এই চেতনা সুপ্ত ছিল। হয়ত তখন বৈষম্য সমাজে সর্বব্যপী না হওয়ার কারণে ঘুম ভাঙ্গেনি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বৈষম্যেরও বিস্তার ঘটলো। পনেরো-ষোল শতকের ইতালি, বিশেষ করে ফ্লোরেন্সে এই দ্বন্দটা প্রকট হলো এবং মানবচেতনার লক্ষণগুলো সুস্পষ্ট হলো। ইতিহাসে যা নবজাগরণ বা রেনেসাঁস বলে খ্যাত।

এই দু'তিনশো বছর পর উনিশ শতকে ইংরেজদের হাত ধরে বাংলায় রেনেসাঁসের লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে। ইতালির যেমন ফ্লোরেন্স, ভারতে তেমনি কলকাতা হলো এর ধাত্রভূমি। ধারক রামমোহন হয়ে বিদ্যাসাগর, পরে রবীন্দ্রনাথে পরিপূর্ণতা পেল। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ সহ অনেকেই বলেছেন রেনেসাঁসের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা অবদান individuality বা স্বাতন্ত্রবোধ। এই স্বাতন্ত্রবোধ তো শিশুকাল থেকেই বিদ্যাসাগরে বিদ্যমান। তাই পিতামহ বলতেন 'এঁড়ে বাছুর', পিতা বলতেন নোংরা পোশাক পরতে (যেদিন পরিষ্কার পোশাকের প্রয়োজন)। এরই চরম বহিঃপ্রকাশ কার সাহেবের সামনে টেবিলে পা তুলে দেওয়া। কিন্তু বিদ্যাসাগরের মানবচেতনা আরও উন্নত হলো মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বহুকাল তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের মোড়কে লুকিয়ে রাখা হতো। অনেকটা উইয়ের ঢিবির আড়ালে ঋষি বাল্মিকী। বর্তমানে অবশ্য মোড়ক উন্মোচনের কাজ শুরু হয়েছে। স্বল্প পরিসরে আমরাও সেই চেষ্টাই করব।

তাঁর মানবাধিকার-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রামের দুটি ক্ষেত্র— নারী ও আদিবাসীদের স্বাধিকার-কে আমরা বেছে নিয়েছি। উনিশ শতকের সেই শ্রেষ্ঠ বাঙালি ছিলেন আধুনিকতার অগ্রদূত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম যোদ্ধা।

বঙ্গদেশে নারীশিক্ষা প্রচলন বিদ্যাসাগরের এক অন্যতম প্রধান কীর্তি তো বটেই, কিন্তু আরও বড়ো কৃতিত্ব নারী-মুক্তির জন্য লড়াই। মাত্র তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে আমরা তাঁর এই প্রচেষ্টাকে চিত্রায়িত করব।

তিনি সমাজ সংস্কার ও সামাজিক উন্নতিকল্পে যে প্রতিজ্ঞা-পত্র প্রচলন করেছিলেন, তাঁর কয়েকটি সূত্র আমরা উল্লেখ করছি।

'১) কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইব।

২) একাদশ বর্ষ পূণ না হইলে কন্যার বিবাহ দিব না।

৩) কুলীন, বংশজ, শ্রোত্রিয় অথবা মৌলিক ইত্যাদি গণনা না করিয়া স্বজাতীয় সৎপত্রে কন্যা দান করিব।

৪) কন্যা বিধবা হইলে এবং তাহার সম্মতি থাকিলে, পুনরায় তাহার বিবাহ দিব।

৫) অষ্টাদশ পূর্ণ না হইলে পুত্রের বিবাহ দিব না।

৬) এক স্ত্রী বিদ্যমান থাকিলে আর বিবাহ করিব না।

৭) যাহার এক স্ত্রী বিদ্যমান আছে, তাহাকে কন্যাদান করিব না।' (৩)

উল্লিখিত প্রতিজ্ঞার ১০টির মধ্যে ৭টিই নারীর অধিকার সংক্রান্ত। ৪ নং প্রতিজ্ঞাটিতে বলা হয়েছে কন্যার সম্মতি ব্যতীত বিধবা বিবাহ হবে না। অর্থাৎ নারীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কখন? যখন নারীকে পণ্য বলে মনে করা হতো। পাত্র-পাত্রীদের বিয়ের ন্যূনতম বয়েস নিয়ে তিনি ভাবছেন, যখন গৌরীদানই ছিল সমাজের নিয়ম। কৌলীন্য প্রথার অভিশাপ, পলিগমির বিরুদ্ধতা করছেন। ভাবতে অবাক লাগে, উনিশ শতকে বিদ্যাসাগর বলছেন কৌলিন্য না দেখে স্বজাতীয় সৎপাত্র (৩) দেখ, অথচ একুশ শতকে বাহালি বাবা-মা রবিবারের আনন্দবাজারে কুলীন পাত্র/পাত্রীই খুঁজে বেড়ান।

দ্বিতীয় সূত্র হিসেবে সেকালের বিখ্যাত, পতিতা রমণীর বিষয়াধিকারের মামলাটির উল্লেখ করব। আসামের গোলাঘাটের বিধবা কেরী কলিতানী স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হন। জ্ঞাতি দেওর মণিরাম কলিতা, বিধবার চরিত্রহানীর অপরাধে উত্তরাধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার দাবিতে গোলাঘাটের নিম্ন আদালতে মামলা করেন। অবশেষে এটি কলকাতা হাইকোর্টে নথীভুক্ত হয়। ১০ জনের ফুল বেঞ্চ গঠিত হয়েছিল। এঁদের অন্যতম ছিলেন বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু দ্বারকানাথ মিত্র। শাস্ত্রের মতামত জানার জন্য হাইকোর্ট থেকে বিদ্যাসাগর, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও আরও একজনকে নিযুক্ত করা হয়। বিদ্যাসাগর ছাড়া বাকী চার পণ্ডিতই রায় দিলেন চরিত্রহানীর জন্য মহিলার সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত। দ্বারকানাথ সহ আরও দুই বিচারপতি, একই মত দিয়েছিলেন। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের বিচারে বিদ্যাসাগরের মতটাই গৃহীত হল। হিন্দু বিধবা চরিত্রহানীর কারণে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন না। পরবর্তীকালে প্রিভি কাউন্সিলও একই রায় দেন। চারিদিকে ছিছি পড়ে গেল। বিদ্যাসাগরের সমালোচনায় বঙ্গসমাজ মুখরিত হয়ে উঠল। বলা হচ্ছিল, এই রায়ের ফলে বিধবারা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাই তিনি ওইরূপ মতামত দিয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বলেছিলেন,—

'আমি অবশ্য ভ্রষ্টাচারের পক্ষপাতী নই, কিন্তু একজন বিষয়ের অধিকারিনী হইলে, কেমন করিয়া বলিব, আবার সে বিষয়চ্যুত হইবে।' (৪)

কালের নিরিখে বিদ্যাসাগরের অভিমতটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মনে রাখতে হবে বিচারপতি দ্বারকানাথ ছিলেন তাঁর প্রাণের বন্ধু, অপর দুই পণ্ডিত, 'ভরত শিরোমণি ও তারানাথ' ছিলেন সহকর্মী ও সহযোদ্ধা। তবু তিনি স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি।

তৃতীয় সূত্রটি 'বারবনিতা'দের নিয়ে। উনিশ শতকে, কলকাতায় বারবনিতাদের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে তিরিশ হাজার ছাড়িয়ে যায়। কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেরই যাতয়াত ছিল। সব এলাকায়, এমনকি স্কুল-কলেজের আশেপাশেও এরা বাসা বাঁধত। ১৮৬২-তেই হুতোম প্যাঁচা তাঁর নকশায় কলকাতাকে 'বেশ্যাশহর' হসেবে চিহ্নিত করেন। প্রসন্নকুমার পালের বেশ্যাসক্তি নিবর্তক, তারিণীচরণ দাসের বেশ্যা বিচরণ, হরিহর নন্দীর এমন কর্ম আর করবো না, রাধামাধব হালদারের বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি— প্রভৃতি প্রহসন-নকশায় বেশ্যার উপদ্রব এবং এদের প্রতি আসক্তির পরিণাম দেখানো হয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে বারবনিতাদের জন্য স্বতন্ত্র পল্লী নির্দিষ্ট করে দেবার আবেদন জানানো হয়। ভদ্রপল্লী থেকে বেশ্যালয়গুলিকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে বিভিন্ন দিক থেকে আবেদন আসতে থাকে। [তথ্যসূত্র: কৈলাসবাসিনীদেবী : রচনাসংগ্রহ। সম্পাদনা অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩১৯] তৎকালীন ব্রাহ্ম সহ সকল শিক্ষিত বাঙালি ও মিশনারিরা সবাই বারবনিতাদের বিরুদ্ধেই বলেছেন, প্রস্তাব দিয়েছেন— হয় উচ্ছেদ নয় একঘরে করা হোক। একমাত্র বিদ্যাসগরই তখন মানবিক দৃষ্টিতে সমস্যাটা দেখেছিলেন। তাঁদের নারীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। দুজনের দুটি রচনা আমরা উদ্ধৃত করছি। প্রথমে বিহারীলাল (পৃ. ২৩৯) পরে ইন্দ্র মিত্র (পৃ. ৩০)

> 'শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে রাত্রিকালে বাড়ি ফিরিবার সময় কোন অভাগিনী বেশ্যাকে উপার্জন আশায় কষ্টভোগ করিতে দেখিলে, তিনি তাহাকে টাকা-পয়সা দিয়ে সে রাত্রির জন্য তাহাকে ফিরিয়া যাইবার পরামর্শ দিতেন।'
>
> 'সাতপড়িপতি রায় বলেছেন : "একদা বৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন এক বারাঙ্গনা বর্ষসিক্ত হইয়া আত্মবিক্রয়ের জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। ক্রেতৃবিহীন অথচ এই কুলত্যাগিনী নারীর অন্নসংস্থানের দ্বিতীয় উপায় নাই।— বিদ্যাসাগরের করুণ চিত্ত দ্রব হইয়া গেল, তিনি বারাঙ্গনার হাতে আট আনা পয়সা দিয়া বলিলেন, "যাও মা, আর জলে ভিজো না"।

বেশ্যাবৃত্তির মূল করণ যে 'অন্নসংস্থান' সেটা সেই দুশো বছর আগেই বিদ্যাসাগর উপলিব্ধ করতে পেরেছিলেন। তাই মা সম্বোধন করে, অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে দেন। এটা তাঁর দয়া নয়, করুণা নয়। নারীর শ্রম-মূল্যকে অধিকার দেওয়া। এত বড় মানবপ্রেমিক এই পোড়া দেশে অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন এক স্বপ্নদ্রষ্টা, মানবাধিকার-অর্জন সংগ্রামের পথিকৃৎ। আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় তিনি শুধু ভারত কেন, সম্ভবত এশিয়া মহাদেশেই অগ্রগণ্য। তিনিই প্রথম যিনি সাঁওতাল পরগনার আদিবাসীদের সহ-নাগরিকের মর্যাদা দিয়েছিলেন, তাদের সারল্য, সততা, সহজ-সরল সমাজ-ব্যবস্থাকে বহির্বিশ্বে প্রচার করেছিলেন। এশিয়া মহাদেশে নৃতত্ত্বের আলোচনার শুরুও তাঁর হাত ধরে।

জীবনের অন্তিম আঠারো বছর, ১৮৭৩ থেকে ১৮৯১, তিনি কার্মাটাড়ে দুঃস্থ দরিদ্র সাঁওতালদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই বিদ্যাসাগর সাঁওতাল পরগনার মানুষের কাছে দেবতা হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে এত দূরে কেন চলে গেছিলেন? সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দৌহিত্র সন্তোষকুমার

অধকারী, জীবনীলেখক চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিহারীলাল সরকার কেউই বিস্তৃত বিররণ দেননি, শুধু বলেছেন যে ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে এবং সংসার জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়েই তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। বাঙালি বুদ্ধিজীবিদের একাংশ এই 'পলায়নী মনোবৃত্তি' নিয়ে বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করেন। কিন্তু সম্ভবত এটা সত্য নয়। ১৮৭৩-৭৪ সালে জনৈক সাহেবের কাছ থেকে বাড়িটি কিনে নাম দিয়েছিলেন 'নন্দন কানন' (বাড়িটি তাঁর সুপুত্র (?) নারায়ণ মাত্র দু'হাজার টাকায় বিক্রি করে দিয়েছিলেন)। এরপরেও বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের পরিচালনা ও উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। (১৮৭৩-য়ে কলেজের স্বীকৃতি, ১৮৭৯-য়ে প্রথম শ্রেণির কলেজে উন্নত, ১৮৮২ সালে আইন পড়া শুরু, ১৮৮৫-তে বি.এ. অনার্স প্রবর্তন), ১৮৭৭-য়ে বাদুড় বাগানে নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ, ১৮৮৬-য়ে সুকিয়া স্ট্রিটে 'দ্য ক্যালকাটা লাইব্রেরি' নামে বইয়ের দোকানের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রমাণ করে তিনি জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। তবে স্বাস্থ্যের অবনতিটা ছিল বাস্তব। কিন্তু তার জন্য দেওঘর/মধুপুর বাদ দিয়ে সাঁওতাল পরগনার কার্মাটাঁড় কেন? সাম্প্রতিক গবেষণা একটা নতুন সম্ভাবনার কথা বলছে। ইংরেজ আমলে দরিদ্র আদিবাসী সাঁওতালদের দুর্বিষহ জীবন-জীবিকা ও তাঁদের সংগ্রামই বিদ্যাসাগরকে তাদের পাশে টেনে এনেছিল।

১৮৫৬ সালের আগে গ্রেটার বেঙ্গলের অন্তর্গত বীরভুম জেলার জঙ্গল মহলের মধ্যেই ছিল মধুপুর, দেওঘর, জামতোড়া প্রভৃতি অঞ্চল। তখন সাঁওতাল পরগনার অস্তিত্বই ছিল না। মিরকাশীম পরাস্ত হতেই ব্রিটিশরা নির্বিরোধী-শান্তিপ্রিয় সাঁওতালদের উপর চূড়ান্ত অত্যাচার শুরু করে। জাহাজ, বাড়ি ও আসবাব নির্মাণ, খনি এবং রেল কামরা ও লাইনের স্লিপারের জন্য কাঠের প্রয়োজনে অরণ্য ধ্বংসের ফলে সাঁওতাল-জীবন বিপর্যস্ত হয়। শত অনুরোধেও বৃক্ষছেদন বন্ধ হয়নি। এর উপর ছিল ঔপনিবেশিক শাসন সঞ্জাত মধ্যসত্বভোগীর উৎপীড়ন, অর্থাৎ জমিদারদের ইচ্ছামতো খাজনা বৃদ্ধি ও মহাজনী শোষণ। ১৮৫৬ সালের ক্যালকাটা রিভিউ-য়ের বর্ণনার সামান্য অংশ থেকেই এর স্বরূপ বোঝা যাবে।

> 'জমিদার, আরও যথাযথভাবে বলিলে, গোমস্তা, সরবরাহকার, পিওন ও মহাজন প্রভৃতি জমিদারি কর্মচারীবৃন্দ, পুলিশ, রাজস্ব আদায়কারী (নায়েব, সাজোয়াল) এবং আদালতের আমলা— কর্মচারীগণ সকলে একত্রে মিলিয়ে সাঁওতালদের অপমানিত করা এবং প্রহার ও অন্যান্য প্রকার উৎপীড়নের জাল বিস্তার করিয়াছে। ঋণের সুদ শতকরা পঞ্চাশ টাকা হইতে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত আদায় করা হইতেছে।' (৭)

উৎপীড়ন ও অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে সাঁওতালরা সিধু-কানু, চাঁদ ভৈরবদের নেতৃত্বে মহাজন, জমিদার ও রেলওয়ে ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন অরণ্য ধ্বংস ও উপরোক্ত শোষণের বিরুদ্ধে লাট সাহেবকে নালিশ জানাতে ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতার উদ্দেশে আনুমানিক ষাট হাজার সাঁওতালদের এক বিশাল গণ মিছিল রওনা হয়। কলকাতা যাওয়ার পথে ময়ূরাক্ষী নদী পার হওয়ার সময়, রাণীশ্বর ব্লকের আমজোড়া ঘাটে ইংরেজ সৈন্যরা গুলি চালিয়ে প্রায় পঁচিশ হাজার সাঁওতালকে হত্যা করে। ময়ূরাক্ষীর জল রক্তে লাল হয়ে যায়। অনেকের মৃতদেহ সৈন্যরা পাশের একটি পুকুরে ফেলে দেয়। সেটা এখনও সাঁওতাল-কাটা-পুকুর নামে পরিচিত। সিউড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন কেঁন্দুয়া জঙ্গলে বিদ্রোহীদের গণকবর দিয়ে ইংরেজরা বিদ্রোহ দমন করেন এবং তারপরেই সার্ভে সেটেলমেন্টের কাজের সৃষ্টির অজুহাতে ১৮৫৬ সালে বীরভূমের পশ্চিমভাগকে সাঁওতাল পরগনা নামকরণ করে স্বতন্ত্র জেলা ঘোষণা করা হয়।

এই বিদ্রোহী দরিদ্র মানুষগুলোকে সাহায্যের জন্যই তিনি সুদূর কার্মাটাড়ে ছুটে গেছিলেন। অর্থাৎ জীবন থেকে পলায়ন নয়, জীবনস্রোতে ঝাঁপ দেওয়া। কিন্তু খবর পেলেন কোথা থেকে? তৎকালীন সংবাদ মাধ্যম ও সমাজ পুরো বিষয়টা নিয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিল। সংবাদদাতা সম্ভবত বর্ধমানের আবদুল জব্বার। ইনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের আইনজ্ঞ বন্দু গোলাম আসগর জায়েদির ছেলে এবং সাঁওতাল পরগনার দ্বিতীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বর্ধমানে ম্যালেরিয়া— ত্রাণকার্যে আবদুল জব্বারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠতা হয়।

আদিবাসীরা মিথ্যাচার ও লোভের জন্য তথাকথিত ভদ্র বাঙালিকে সহ্য করতে পারত না। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে তারা আপন করে নিয়েছিল। দাদা, বাবা, জ্যাঠা প্রভৃতি সম্পর্ক পাতিয়েছিল। তিনি অসুস্থ শরীরেই প্রতি সকালে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরতেন, প্রত্যেকের খোঁজ নিতেন, রোগীর চিকিৎসা করতেন, পথ্য দিতেন। তাঁর হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা তাদের কাছে দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল। লোক খাওয়ানো ছিল বিদ্যাসাগরের স্বাভাবিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাঁওতালদের খাওয়ানোর মধ্যে যে স্বাভাবিক ভালোবাসা, আন্তরিকতা, সেটা অন্যত্র দেখা যেত না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তাঁর অবিস্মরণীয় রচনায় (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ'-য়ের ভূমিকা) স্মরণীয় করে রেখেছেন বিদ্যাসাগরের খাওয়ানো। সাঁওতালদের ভুট্টা কিনে, তাও আবার তাদের নির্ধারিত দামেই, তাদের খাওয়াতেন। ঘটনাকাল ১৮৭৮ সালে সেপ্টেম্বর।

> '... তাহারা উঠিয়া বলিল— খুব খাইয়েছিস বিদ্যাসাগর। ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। বিদ্যাসাগর রকে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, আমিও আশ্চর্য হইয়া দেখিতে লাগিলাম; ভাবিলাম এ রকম কেউ বোধহয় আর দেখিতে পাইবে না।' (৮)

এই যে খাওয়ানো বা উপহার দেওয়া, এটা কিন্তু একতরফা ছিল না। সাঁওতালরা খেতের ফল-মূল, এমনকি পোষা মুরগি তাঁর হাতে তুলে দিত। মাংস খান না বলে, মুরগি নিতে অস্বীকার করলে কেঁদে ভাসাত। বাধ্য হয়ে নিতেন। যিনি বর্ধমান রাজপরিবারের রাজ-আতিথ্য, ব্রাহ্মণদের সম্মান-দক্ষিণা দেওয়ার বাজ-সংস্তার, বীরসিংহ গ্রাম পত্তনী দেওয়ার প্রস্তাব— সবকিছু অবলীলায় প্রত্যাখান করেন, তিনিই কার্মাটাড়ে পড়শীর দেওয়া উপহার সানন্দে গ্রহণ করছেন, পইতাধারী গ্রহীতা মুরগি হাতে নিয়ে হাসছেন, পড়শীদাতারাও হাসছে। সাঁওতালরা তাঁকে নিজেদের লোক বলেই ভাবত। তাই তো নির্বিদ্বায় ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে শাড়ি নিত, বাছাবাছি করত, কখনও বা বিদ্যাসাগরের গায়ে পড়ত। সুখে বিদ্যাসাগরকে সংবাদ দিত, দুঃখে আশ্রয় নিত।

হয়ত এই অশিক্ষিত, দরিদ্র কিন্তু সৎ-সরল সাঁওতালদের সান্নিধ্য তাঁর সাময়িক স্থবিরতা দূর করে দিয়েছিল। তিনি নতুন উন্মাদনায় জেগে উঠেছিলেন।

> 'বিদ্যাসাগর এদের মধ্যে নতুন একটা জগৎ খুঁজে পেলেন। তিনি বন্ধু হয়ে গেলেন সেই আদিবাসী মানুষদের। ...তাদের পরিশ্রমজাত দ্রব্যাদি যা বাজারে বিক্রি হত না, তিনি নিজেই কিনে নিতেন। তারপর আবার বিলিয়ে দিতেন, যারা বেশী দুঃস্থ তাদের মধ্যে। ...বাগানে ঢুকবার দরজার পাশে যে তিনটি ঘর ছিল, সেগুলিতে থাকতো দূরের গ্রাম থেকে আসা রোগীরা।' (৯)

বিদ্যাসাগর ওখানে স্কুল স্থাপন করেছিলেন। ওই অঞ্চলের প্রথম স্কুল। স্কুল চালানোর জন্য মাসিক বরাদ্দ ছিল। লোকমুখে শোনা যায় কার্মাটাড়ের অনুর্বর জমিকে উর্বর চাষযোগ্য জমিতে পরিণত করার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও বিদ্যাসাগর যে কৃষিকাজ ও কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে পড়াশোনা করতেন তাঁর লাইব্রেরি সেই প্রমাণ দেয়। মাটির কাছাকাছি অনাবিল আনন্দের মাঝে বিদ্যাসাগর

বেঁচে থাকতে চাইতেন। কার্মাটাড়ে সাঁওতালদের সঙ্গে তাঁর পারস্পরিক বিশ্বাস ও নির্ভরতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, যা কলকাতার তাঁর স্বশ্রেণির মানুষের সঙ্গে কদাচিৎ স্থাপিত হতে পেরেছিল। শহরের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজ সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে। পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নতুন মানুষের চাষ করিতে পারিলে, তবে এদেশের ভাল হয়।' কিন্তু সাঁওতালদের মধ্যে তিনি মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এমন এক অনাহত ঐক্যের বাতাবরণ ছিল যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মনে হয়েছিল 'যেন কোনও মহর্ষির আশ্রম।' রবীন্দ্রনাথও এই ঐক্যের সূত্রটি সম্পর্কে লিখেছেন,—

> 'সরল ও সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁর স্বজাতীয় বাঙালির অপেক্ষা সাঁওতালদের সহিত আপনার যতার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।' (১১)

বিদ্যাসাগর তাঁর হতাশা ও ক্ষোভের সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন মানুষের মধ্যেই।

পৌরাণিক যুগ থেকে আজ অবধি ভারতের জনজাতি অর্থাৎ আদিবাসীদের একমাত্র পরিচয় ওরা বর্বর, অসভ্য, হিংস্র খুনি। পৌরাণিক রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ গঠনের জন্য আদিবাসীদের নির্বিচারে হত্যা করে খান্ডববন দহন করা হয়। আবার কয়লা-তেল উত্তোলনের জন্য আদিবাসীদের গণতান্ত্রিক ভারতে বাস্তুচ্যুত করা হয়। ২০১২ সালে ইউনাইটেড নেশনস ওয়ার্কিং গ্রুপ অন হিউম্যান রাইটস ইন ইন্ডিয়া'-র পক্ষ থেকে একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল যে আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকে বাঁধ নির্মাণ, খনিজ উত্তোলন, শিল্পায়ন সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ছয় থেকে সাড়ে ছয় কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় যা কিনা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। এদের ৪০ শতাংশেরও বেশি আদিবাসী এবং ৪০ শতাংশ গ্রামীম গরিব ও দলিত। এই প্রান্তিক মানুষদের অধিকাংশই যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পাননি। গত এক দশকে এই ধারার কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। এখনও উন্নয়নের নামে কলোনি, বস্তির উপর বুলডোজারের হানাদারি চলছে। কর্পোরেটের হাতে প্রাকৃতিক সম্পদ তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে নির্বচারে প্রান্তিক মানুষের উচ্ছেদ চলছে। আজ থেকে দুশো বছর আগেই, বিদ্যাসাগর এক প্রান্তিক, দলিত তথা আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানবাধিকার রক্ষার সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। ভারত তথা এশিয়া মহাদেশে বিদ্যাসাগরই সর্বজনের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও রূপায়ণে পথিকৃৎ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শ্রমকে মূল্য দিয়ে তিনি তাদের সহনাগরিকের মর্যাদা দিয়েছিলেন। এই কাজে তিনি ধর্ম ও ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র থেকে ঈশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। তাই ১৮৯১-এর ২৯ জুলাই একমাত্র কার্মাটাড়েই প্রান্তিক জনপদে সেই আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল— নাই— আমাদের ঈশ্বর নাই।

প্রামাণ্যসূচী—

(১) চরিত্রপূজা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র রচনাবলী, প.ব. সরকার, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৯৯৩।

(২) বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। বিনয় ঘোষ। প. ৩৭০।

(৩) বিদ্যাসাগর। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৃ. ২৩৩।

(৪) বিদ্যাসাগর। বিহারীলাল সরকার। পৃ. ৩৩২।

(৫) ওই। পৃ. ২৩৯।

(৬) করুণাসাগার বিদ্যাসাগর। ইন্দ্র মিত্র। পৃ. ৩০।

(৭) বিদ্যাসাগর, সোমপ্রকাশ পত্রিকা ও বাংলার কৃষক সমাজ। পূর্ণেন্দু শেখর মিত্র, সংবর্তক। পৃ. ৫১৬।
(৮) কার্মাটাড়ে বিদ্যাসাগর। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। The Golden Book of Bidyasagar. পৃ. ৬২৯।
(৯) কার্মাটাড়ে বিদ্যাসাগর। সন্তোষ কুমার অধিকারী। পৃ. ৩৫।
(১০) রবীন্দ্র রচনাবলী। জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ। একাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৩৩।
সহায়ক গ্রন্থ—
(১) করুণাসাগর বিদ্যাসাগর। ইন্দ্র মিত্র। আনন্দ। ২০১৯।
(২) বিদ্যাসাগর। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রভৃতি সংস্করণ। ১৪২৩ বঙ্গাব্দ।
(৩) বিদ্যাসাগর। বিহারীলাল সরকার। সম্পা. প্রলয়কুমার প্রামাণিক। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। ১৯৮৬।
(৪) বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ। বিনয় ঘোষ. ওরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়াল প্রা. লি.। ২০২৩।
(৫) রবীন্দ্র রচনাবলী। প.ব. সরকার প্রকাশিত।
(৬) সংবর্তক পত্রিকা, জানুয়ারি, ২০২০।
(৭) কৈলাসবাসিনী দেবী: রচনা সংগ্রহ। সম্পাদনা অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ। ২০১৯।

প্রসঙ্গ ঃ আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস

অশোক রঞ্জন ধর

১৯৯০ সালের ১৪ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি সিদ্ধান্ত (নং ৪৫/১০৬) গ্রহণ করে যে ১ অক্টোবর দিনটি সারা বিশ্বে প্রবীণ নাগরিক দিবস সিহাবে পালিত হবে। কিন্তু এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনেক পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রসংঘে এই বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলছিল।

১৯৪৭ সালে আর্জেন্টিনা সর্বপ্রথম এই বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপন করে। ১৯৪৮ সালে সাধারণ পরিষদে এক প্রস্থ আলোচনা হলেও কোনো প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি আন্তর্জাতিক মহল। ১৯৬৯ সালে অনেকটা ব্যাপক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাসহ বয়স্কদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘে উত্থাপন করে মাল্টা (Malta)। কিন্তু তখনও কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।

১৯৮২ সালের প্রথমার্ধে রাষ্ট্রসংঘ এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব (৩৭/৫১ নং) গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক স্তরে বয়স্ক বিষয়ে আলোচনা ও তার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ফলস্বরূপ ১৯৮২ সালের শেষার্ধে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে এক মহাসম্মেলন (World Assembly on Ageing) অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গৃহীত হয় Vienna International Plan of Action of Ageing। রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্যারাষ্ট্র, আই. এম. এফ (IMF), World Bank এবং অনেক এন. জি. ও. এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। বয়স্ক বিষয়ে আন্তর্জাতিক এক পূর্ণাঙ্গ দলিল ছিল এটি। পরে ওই বৎসরেই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩৮/২৭ নং প্রস্তাবের দ্বারা এই সুপারিশ সমূহ গ্রহণ করে।

১৯৯১ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিকষদ বিশ্বের প্রবীণজনদের জন্য একটি নীতিবিষয়ক প্রস্তাব (নং ৪৬/৯১) United Nations Principles for Older Persons গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবের চারটি প্রধান

বিষয়— ১) স্বাতন্ত্র্য (Independance), ২) অংশগ্রহণ (Participation), ৩) যত্ন (Care), ৪) আত্মতৃপ্তি ও সম্মান (Self-fulfillment)।

১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও প্রথমে কেবল United Nations Non-Governmental Organisation এর পক্ষ থেকে দিবসটি পালন করা হতো। ১৯৯৮ সাল থেকে এই কর্মসূচী সর্বজনীন কর্মসূচী হিসাবে গৃহীত হলে তা সারা বিশ্বে পালিত হওয়া শুরু হয়েছে।

প্রবীণ দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ:—

* সাধারণের মধ্যে প্রবীণদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত করা এবং মানবিকভাবে সেই সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করা।
* প্রবীণ মানুষদের সমাজ গঠনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এবং সভ্যতার বিকাশে তাঁদের অবদানের কথা স্মরণে রেখে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

১৯৯৮ সাল থেকে প্রতি বৎসরই প্রবীণ দিবসের জন্য একটি Theme ঠিক করা হয়।

বিভিন্ন বৎসরে প্রবীণ দিবস পালনের থিম—

(১৯৯৮ ও ২০০০) : Towards a Society for All Ages

২০২৩ : Fulfilling the Promises of the Universal Declaration of Human Rights for Order Persons: Across Generations.

২০২৪ : Our Place— recognising the People and Places that are important to us.

আমাদের দেশে ভারত সরকার দিল্লিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাধ্যমে এই বিশেষ দিনটি উদ্‌যাপন করে। পশ্চিমবঙ্গেও রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই দিবসটি পালন করে।

প্রবীণদের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার কিছু ব্যবস্থা নিয়ে থাকলেও আরও কিছু সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। যেমন—

(১) প্রবীণ রাজ্যনীতি (State Policy for Older Persons) ঘোষণা।

(২) ন্যূনতম মাসিক ছয় হাজার টাকা বার্ধক্য ভাতা।

(৩) রেলের টিকিটের কনশেসন প্রথার পুনঃপ্রবর্তন।

(৪) ব্লক স্তরে বৃদ্ধাবাস স্থাপন ও বেসরকারি বৃদ্ধাবাসগুলির জন্য আইন প্রণয়ন।

(৫) প্রবীণ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা (ধরার জন্য হ্যান্ডেল, বসার আসন, পাদানি ইত্যাদি)। বাসে মিনিবাসে ৪টি আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

(৬) স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে সকল প্রবীণ নাগরিকের অন্তর্ভুক্তিকরণ।

(৭) প্রবীণদের কল্যাণমূলক আইন সমূহের ব্যাপক প্রচার।

আজ যারা প্রবীণ তারা পৃথিবীর সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে, অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে এই প্রবীণ জীবনে উপনীত হয়েছেন। প্রবীণরা করুণা চায় না, তাঁরা চায় তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা। তাঁরা মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে চায়। সরকারি আইন, সাহায্য, স্বেচ্ছাসেবী সংঘটনের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা থাকবে— প্রয়োজনে বাড়বেও। কিন্তু সবার উপরে প্রয়োজন পরিবারের ও সমাজের সাহচর্য্য, মরমী ও দরদী মনের স্পর্শ। তাই ১ অক্টোবর সার্থক হয়ে উঠুক প্রবীণদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের চেতনার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে।

বৃদ্ধাবাসে স্থান নেই তাই অপেক্ষা বাড়ছে

রমাপ্রসন্ন দত্ত

দেশের স্বাধীনতার বয়স হল ৭৭ বছর, জনসংখ্যা ৩৩ কোটি থেকে ১৪৫ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬২ হাজার ৯৯০ জন, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ UNO রিপোর্ট। আমাদের দেশের জনসংখ্যার মধ্যে প্রবীণরা একটা বিরাট অংশ জুড়ে অবস্থান করছেন। বর্তমানে দেশের জনসংখ্যার ১০ শতাংশ রয়েছেন প্রবীণ প্রবীণারা। গড় আয়ু বাড়ছে, সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যদি পিতামাতা ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত নীরোগ শরীরে অতিবাহিত করেন তাদের পুত্র কন্যারা ৮০ বছর পর্যন্ত আয়ু পেয়ে থাকেন। এছাড়া বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি, রোগ প্রতিরোধের আধুনিক পদ্ধতি মানুষকে দীর্ঘায়ু করেছে। আজকাল কী শহরে কী গ্রামে, মানুষ প্রায়ই ৮০ বছর অতিক্রম করছেন। দূরদর্শনের এক সাক্ষাৎকারে কলকাতায় এর যোগী মানুষকে ১২০ বছরে সম্প্রতি দেখা গেল সুস্থ শরীরে। আজকাল মানুষ যদি সকল প্রকার নেশামুক্ত, সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাপরায়ণ জীবনযাপন করেন গড় আয়ু ৬৮ বৎসর। বিশ্বে জনসংখ্যায় ভারত প্রথম স্থানে রয়েছে।

পারিবারিক জীবনে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বাবা মা ও এক বা দুই সন্তান নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অনু পরিবার। অধিকাংশ পরিবারে প্রবীণ মা ও বাবা থাকেন না বা বলা যায় রাখা হয় না। কর্ম উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অংশে বা বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে ছেলেমেয়েরা। তাই বাবা মা বৃদ্ধ বয়সে হয়ে পড়ছেন সম্পূর্ণ একা। এদের একজনের বিয়োগে অসহায় হয়ে পড়েন অন্যজন।

শুনলাম, গড়িয়ায় একা থাকতেন এক বৃদ্ধ। তাঁর পচাগলা দেহ পাওয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে যখন প্রতিবেশীরা দুর্গন্ধ পেলেন তখন জানা গেল তিনি মারা গিয়েছেন। সেজন্য একা বৃদ্ধ বয়সে থাকা অনেক অসুবিধার, তাই খোঁজ করা হয় বৃদ্ধাবাসের। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি বৃদ্ধাবাস মাত্র একটি। কিন্তু 'পিতামাতাও প্রবীণ নাগরিকদের সুরক্ষা আইনে' বলা আছে, প্রতি জেলায় একটি বৃদ্ধাবাস স্থাপন করতে হবে। তা যে কবে বাস্তবায়িত হবে জানা নেই। এক যদি সরকারি উদ্যোগে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ প্রচেষ্টায় করা হয় তবেই কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। বেসরকারি বৃদ্ধাবাসে স্থান নাই। দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষায় থাকতে হয় বৃদ্ধবৃদ্ধাদের। কবে যে সেখানে স্থান পাবেন বৃদ্ধাবাসের পরিচালকরা বলতে পারেন না। একটি আসন খালি হয় একজনের মৃত্যুর পর। শতাধিক আবেদনপত্র জমা থাকে একেকটি বৃদ্ধাবাসে আসন পাওয়ার জন্য।

যতদিন যায় চাহিদার তুলনায় বৃদ্ধাবাস কম থাকায় খরচ বেশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোথাও ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ এককালীন 'সিকিউরিটি ডিপোজিট' জমা দিতে হয়। তারপর মাসিক খরচ ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। খবর নিয়ে জানা গেল, আবাসিকদের যে কোনো অসুখ হলে খরচ নিজেকে বহন করতে হবে, আবাস থেকে কোনো খরচ করা সম্ভব নয়। এমন কথাও শুনতে হল যদি আবাসিকদের হাত পা ভাঙে ২ থেকে ৩ লাখ টাকা খরচ লাগে। তাঁরা এই ব্যয় করতে পারে না। অনেক বৃদ্ধাবাসে স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে রাখার ব্যবস্থা নেই। সেজন্য অশীতিপর বৃদ্ধবৃদ্ধারা আলাদা বৃদ্ধাবাসে বসবাস করছেন আর পরলোকে যাওয়ার জন্য দিন গুনছেন এমন অনেকেই আছেন।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সেভাবে তাঁদের চাহিদামতো হাসপাতাল, বৃদ্ধাবাস, বয়স্ক মানুষের সুলভ চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। ডাক্তারবাবুরা প্রতি ছয় মাস অন্তর ফি বাড়িয়ে চলেছেন, কখনোই ভাবেন না অধিকাংশ দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষ কী ভাবে চিকিৎসার খরচ বহন করবেন। সরকারি হাসপাতালে প্রচণ্ড ভীড়। সারাটা দিন অপেক্ষা করতে হয় বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য। এসব প্রবীণ প্রবীণাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা।

আমরা আশা করতে পারি এই রাজ্যে জনপ্রিয় কন্যাশ্রী প্রকল্প যেভাবে সফলতা লাভ করেছে সেইভাবে বৃদ্ধশ্রী প্রকল্প যদি কার্যকরী করা হয় সমাজে বিরাট উপকার সাধিত হবে। প্রয়োজনে বিদেশে প্রবীণ মানুষের যে 'সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প' আছে তার ভালো দিকগুলি আমরা গ্রহণ করতে পারি। এর জন্য নবীন বয়সে প্রবীণদের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। প্রতিটি জেলা, মহকুমায় বৃদ্ধাবাসের ব্যবস্থা করা দরকার। উন্নত দেশগুলি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে প্রবীণদের জন্য কেমন সফল হয়েছে তা অনুধাবন করতে হবে। বিদেশিদের সাথে কথা বলে জেনেছি, তরুণ বয়সে রোজগার শুরু থেকে এই প্রকল্পে তারা যোগ দেন। এজন্য প্রতি মাসে সদস্য হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। উন্নত দেশের মতো আমাদের দেশে যদি আয়ের এক শতাংশ 'সামাজিক সুরক্ষা কর বাবদ' ধার্য করা হয় এই 'সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প' আমাদের দেশে চালু করা যায়। চাই সদিচ্ছা আর এই বিরাট সমস্যা মোকাবিলা করার কার্যকারী ব্যবস্থা। এইজন্য বিশ্বের উন্নত দেশগুলি থেকে এর পথনির্দেশিকা পেতে পারি, অন্যান্য দেশের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করতে পারি। সমাজে উচ্চ মধ্য ও নিম্ন বিত্তের সকল প্রবীণ প্রবীণাদের প্রয়োজন সামাজিক সুরক্ষার ছাতার নীচে থাকা। আমাদের প্রবীণদের জন্য কার্যকারী নীতি এখনো রাজ্যে তৈরি হয়নি। এটি অবিলম্বে করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার একটি নীতি তৈরি করেছেন অনেক দিন আগে, কিন্তু সেটিকে আধুনিকীকরণ প্রয়োজন। আমরা আশা রাখব, রাজ্য সরকার অবিলম্বে 'স্টেট অ্যাকশান প্ল্যান ফর এল্ডার পার্সন' প্রস্তুত করে প্রবীণদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণে সর্বপ্রকার কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আমরা যদি প্রাচীন ব্যবস্থার দিকে তাকাই দেখব একান্নবর্তী পরিবারে সকলে একত্রে থাকতেন, ছোটোখাটো অসুবিধা হলেও প্রত্যেকে আমরা অপরের জন্য এই ধারণাটি ছিল। শিল্প বিপ্লব ও দেশভাগের পর যৌথ পরিবার প্রথা ব্যাপক ভাঙন শুরু হল। কাজের খোঁজে জীবিকার সন্ধানে মানুষ বহু দিকেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আর ওখানেই দেখা দিল অনু-পরিবার 'হাম দো হামারা এক' এই ধারণা। ক্রমে ওই একটি সন্তান অতি যত্নে লালিত হয়ে উঠছে আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর। বড়ো হয়ে বাবা মা তার কাছে পর হয়ে যাচ্ছে। এজন্য বৃদ্ধাবাস বৃদ্ধবৃদ্ধাদের শেষ অবলম্বন। কিন্তু সেখানেও 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো এ তরী'। দেখতে দেখতে ছটি যুগ পার করে পরিবর্তনটা বিশেষ ভাবে চোখে পড়ছে। আগে আমাদের দেশকে বলা হত বার্ধক্যের বারাণসী। বৃদ্ধদের মান সম্মান যথেষ্ট দেওয়া হত। প্রবীণদের সংখ্যা ২০৩০ সালের মধ্যে বিরাট আকার হবে, দেশের অর্ধেক মানুষ হবেন প্রবীণ মানুষ। এর জন্য দেশে উপযুক্ত পরিকাঠামো থাকা একান্ত আবশ্যক। বিশেষ করে নজর দিতে হবে, উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা। এই সময় প্রবীণ মানুষ একাকীত্ব থেকে হীনমন্যতায় ভোগেন। নিজেদের আত্মসম্মান বোধ হারিয়ে কষ্ট পান। এজন্য প্রবীণদের বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রাখা দরকার। যেমন লেখা, গল্প, গান, কবিতা, বাগান করা ও অন্যান্য সৃজনশীল কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখা।

শারীরিক বিভিন্ন সমস্যা ষাট বৎসর অতিক্রান্ত মানুষের মধ্যে দেখা যায়। যেমন অস্থিসন্ধিতে যন্ত্রণা, উচ্চ রক্তচাপ, চোখে কম দেখা, প্রস্টেটের সমস্যা, ভুলে যাওয়া ও স্মৃতিলোপ পাওয়া। কানের সমস্যা হয়, অল্প আওয়াজ শুনতে না পাওয়া, সেজন্য মোবাইল ফোন যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। সর্বদা চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চলতে হবে। অল্প ব্যায়াম ও হাঁটাচলার মধ্যে যতটা সম্ভব থাকতে হবে। যতটা পারা যায় অপরের সঙ্গে মিশতে হবে, নিজেকে আনন্দে রাখতে হবে।

এটা মনে রাখতে হবে, ষাট বৎসরের পর একটা অতি দীর্ঘ সময় যাতে আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করা যায় তার ব্যবস্থা যৌবনকাল থেকেই করতে হবে নতুবা প্রবীণ অবস্থায় জীবন যাপন কষ্টকর হয়ে পড়বে। আমি সরকারের থেকে বা কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে কী সুবিধা পাব সেটা না ভেবে মানুষ হিসেবে নিজের দীর্ঘ জীবনের পাথেয় নিজেকেই ব্যবস্থা করতে হবে।

দক্ষিণের মোহময় অলীক দর্শন

ছায়া মুখার্জী

বেশ অনেকদিনের কথা। রোজই ভাবি যে দক্ষিণের অত্যাশ্চার্য দর্শনের কথাগুলি না লিখলেই নয়। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদে পরম আদরের উমা সাহা। যাকে বেথুনের সবাই উমাদি বলে জানেন। তার জন্যই আমার যাওয়াটা সম্ভব হয়েছিল। মনের অদম্য ইচ্ছা থাকলেও কোথাও যাওয়াটা নানা কারণে হয়ে ওঠে না। একদিন সন্ধ্যাবেলা ২০১৪ সালে নভেম্বর মাসে হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। দেখি ওপার থেকে উমার কণ্ঠস্বর—'কাকিমা তিরুপতি যাবেন?' আমি বললাম কী করে সম্ভব? ও তখন বলল যে আমাদের পাড়ায় অন্ধ্র স্কুলে আমার ভোটার আইডি এবং তিনশত টাকা নিয়ে গেলে ওরাই আমাকে অনুমতি পত্র দিয়ে দেবে। তখন তিরুপতি দর্শনে অনুমতি পত্র ছাড়া যাওয়া যেত না। এখন অবশ্য কিউ দিয়ে ঘুরে ঘুরে অনায়াসে মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। ওর কথামতো বাড়িতে সব বলে এক ভদ্রমহিলাকে কিছুটা দায়িত্ব দিয়ে আমি যথারীতি অন্ধ্রস্কুলে যাতায়াত শুরু করলাম। যাওয়াটা ছিল রায় ট্রাভেলের সঙ্গে। ১৯১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু অনুমতি পত্র দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। অন্তত তিনমাস আগে ওই অনুমতিপত্র পাওয়া যায়। এরপর উমা আমাকে বলল যে আমার স্বপ্নাদির যাওয়ার কথা ছিল তার অনুমতিপত্র নেওয়া আছে। সে বিশেষ কারণে যেতে পারছে না। তাহলে আপনি কী ওই অনুমতি পত্র নিয়ে যেতে রাজি আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি রাজি আছি। তবে মনে একটু বেশি সাহসের দরকার। হাতে সময় খুবই কম। এর মধ্যেই সবকিছু গুছিয়ে নিতে হবে। কোথায় যে গিয়ে বিপদে পড়বো কে জানে? যথারীতি উক্ত ভ্রমণ সংস্থা থেকে আমাকে জানাতে থাকল ফোন করে। আমি বললাম, আমার যা কিছু দরকার সব উমার কাছ থেকে নিয়ে নিন। সত্যি ও যদি তখন আমাকে সহযোগিতা না করত তাহলে হয়তো আমার যাওয়াই হত না।

যাকগে, আমাকে ২৪ ডিসেম্বর ২০১৪ রাত নয়টার সময় হাওড়া স্টেশনের বড়ো ঘড়ির নীচে দাঁড়াতে

বলায় আমি আমার মতো যথাস্থানে যথাসময়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। একটু পরেই একে একে সবাই আসতে লাগল। ট্রেন রাত এগারোটায় চেন্নাই মেল। কিন্তু সেদনি প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিকদের ভীড় ছিল। তাই ট্রেনটিতে আরও ছয়টি কামরা জুড়ে উক্ত শ্রমিকদের আগে ট্রেনে তুলে, পরে আমাদের সবাইকে এস নাইনে একে একে তুলে নিল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। যথারীতি ট্রেন ছাড়তে দেরি হয়েছিল অনেকটা। ট্রেনে বসে পোশাক পরিবর্তন করে, ফ্রেস হয়ে ওদের দেওয়া গরম গরম কিছু একটু খেয়ে ঘুম লাগালাম। পরের দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ট্রেনেই কাটালাম। ভোর ৪টা থেকে ৫টার মধ্যে আমরা চেন্নাই নামলাম। আমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলল প্ল্যাটফর্মে। কারণ ওখান থেকেই অন্য আরেকটি ট্রেনে উঠে আমরা নামলাম চেন্নাই সেন্ট্রাল। সেখানে স্টেশনের উল্টোদিকে নানারকম রঙিন কারুকার্য করা মূর্তি ও ফোয়ারা রয়েছে। সেখান থেকে কিছুটা গিয়ে লাগেজ সহ অটোতে উঠে গণেশ ভবনে উঠলাম। সেখানে আমাকে ও উমাকে একটা ঘর দিল। ফ্রেস হয়ে গরম জল খাবার খেয়ে আমাদের বলল দুপুর ১টার মধ্যে লাঞ্চ সেরে যারা যারা তিরুপতি দর্শনে যাবেন—তারা ঐ বাসস্ট্যান্ড থেকে বাস ধরে চলে যাবেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে যাব না। আমরা গাড়ি ভাড়া ঠিক করতে যাব। এবার আমাদের সঙ্গে যারা ছিল, তারা গ্রুপ করে সবাই চলে গেছে। ভবনে একজন ছিল। তাকেই জিজ্ঞাসা করে আমরা দুজন সাহস করে বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি যে স্ট্যান্ড তিরুপতি যাবার শেষ বাস ছাড়ছে। আমরা দুজনে দৌড়ে গিয়ে উঠে মাত্র দুটো সীট পেয়ে বসে গেলাম। মুহূর্তে বাসে লোকভর্তি হয়ে গেল। কোনও পর্যটককে ওরা দাঁড়িয়ে যেতে দেবে না। শুধুমাত্র স্থানীয় মানুষদের দাঁড়িয়ে যেতে দেবে। সঙ্গে সমস্ত প্রমাণপত্র নিয়ে ভয়ে ভয়ে এগোতে লাগলাম। চলার পথে প্রকৃতির সুদৃশ্য দৃশ্যায়ণ মনকে এক অন্য জগতের সঙ্গে একীভূত করে ফেলল মুহূর্তে মধ্যে। দুদিকে পাহাড়ের সারি আবার কোথাও ফোয়ারা, নানারঙের ফুলগাছ দিয়ে ও অন্যান্য নামীদামী গাছ দিয়ে সুসজ্জিত। ওখানকার তামিল ভাষা আমরা বুঝি না। আবার ওরাও আমাদের বাংলা ভাষা বোঝে না। আমরা যাকেই জিজ্ঞাসা রি তিরুপতি কোন্ দিকে? উত্তর হাত দেখায়। এভাবে দ্রুততার সঙ্গে পা চালিয়ে এগোতেই দেখি রাস্তার উপরে একটি তোরণ করে লেখা আছে। পাহাড়ের উপরে উঠে স্টীলের কিউ দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়। ভুলভুলাইয়ার মতো করে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি আর নামছি। সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছি না। তারপর একজন গার্ড আমাদের বলল, ওদিক দিয়ে নীচে নেমে যান একটা বড়ো গেট পাবেন, সেখানে জুতো রেখে অনেকটা গিয়ে একটা বড়ো গেট দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি বেয়ে চেকিং রুমে ঢুকতে হয়। ওনার অনুমতি পত্রে ওনার ছবি ছিল। আমি একটু মুখটা নীচু করে আমার আই কার্ড দেখাতে লাগলাম। ওরা আমার সারা বডি সার্চ করতে লাগল। আমার তে বুক টিপটিপ করতে লাগল। এবার আমি বললাম যে আমরা যেতে পারি? ওরা বলল, হ্যাঁ। আমরা মন্দিরের দিকে রওনা দিলাম। ওপর থেকে সিঁড়ি বেয়ে আবার নীচে নামতে হবে। মেয়েদের ও ছেলেদের আলাদা লাইন। মন্দিরটা খুবই ছোটো। উপরে। সারা দিনরাত বিশাল প্রদীপ জ্বলছে। আবার গোলক ধাঁধা। পিছনের দরজা দিয়ে বের করে নাটমন্দিরে যেতে হয় সেখানে পুজা দেবার ব্যবস্থা আছে। সেখানে দেখলাম বড়ো বড়ো দাঁড়িপাল্লা রাখা রয়েছে। কিলো কিলো সোনা কোনও ব্যক্তির শরীরের ওজনের সঙ্গে মাপ করে কেউ কেউ পূজা দিচ্ছে। আবার যারা যতটা পূজা দেবে অঙ্কটা ইংরাজিতে ও তামিল ভাষায় লেখা আছে। ওর চারিদিকে নারায়ণ স্বামীর মন্দির, অন্নপূর্ণা, গণেশ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও বালাজির মন্দির আছে। এখান থেকে ঘুরে ঘুরে প্রধান ফটকে যেতে হয়। ওখানে পূজার স্লিপ দেখানে ওরা পূজার ডালা

আমাদের হাতে দেয়। চড়াই-উৎরাই করে আবার সমতলে চলে এলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে একটু বাঁদিকে এগোলে দেখা যাবে নারায়ণ মাথায় করে পাল্কিতে বসে সুসজ্জিত হয়ে ধূপ-ধুনা সহযোগে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে পদব্রজে মাসির বাড়ি গমন করবেন। এই উৎসব বছরে একবারই হয়। তাই দেখার জন্য প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। কাজেই আমরা আটকে পড়লাম। আর বেরোবার রাস্তা নেই। সামনে গার্ডওয়াল দিয়ে ব্যারিকেড করা। সামনে বা পেছনে কেউই এগোতে পিছোতে পারবে না। এমন সময় পিছন থেকে অতি আগ্রহী মানুষের দেখার তাগিদে একে অন্যের গায়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ল। আমি তো একদম পড়ে গেলাম। কিন্তু পাশে থাকা মহিলা পুলিশ ও জনতা আমাকে টেনে তুলে পাশে মোটা দড়ির সাপোর্টে দাঁড় করিয়ে দিল। নইলে পদপিষ্ট হয়ে সেদিনই আমার মৃত্যু হত। উমা অল্পের জন্য বেঁচে গেছে। সেইদিনই পদপিষ্ট হয়ে দুজন মারা গেছে। এবার নারায়ণদেব তার ঘরে প্রবেশ করতে ঘণ্টা কাঁশি, ঢাকঢোল ও হাজারো প্রদীপ সহযোগে শুরু হল আরতি। তারপর ব্যারিকেড খুলতে পাশের দরজা দিয়ে সকলে বেরিয়ে দেখলাম যে আমরা যেই গেট দিয়ে তিরুপতি দর্শনে গিয়েছিলাম তার সামনেই জুতো রাখার জায়গায় উপস্থিত হয়েছি। সেখানে আমার জুতো পেলেও উমার জুতো আর পাওয়া গেল না। তাই আমি বললাম যে তোমার জুতো তো কেউ না কেউ পরে চলে গেছে তাহলে তুমি তোমার উপযোগী কোনো জুতো পরে এবার চলো আমরা বাসে উঠি। আমরা জানতাম না যে শেষ বাস আটটায় ছাড়ে। আমরা এসে দেখি একটি বাস দাঁড়িয়ে আছে—তাতে লোকজন উঠে গিয়েছে। আর গেটের সামনে লম্বা লাইন। এর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। স্থানীয় মানুষের মধ্যে দুজন ভালো লোক ছিল তারাই আমাদের বাসে উঠতে সাহায্য করল এবং অন্যরা দুটো সিট দখল করে রেখেছিল। তারা তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে আমাদের বসতে সাহায্য করল। সঙ্গে সঙ্গে বাস ছেড়ে দিল।

তামিল ভাষায় তিরু অর্থ টাকা আর তারই দেবতা হল তিরুপতি। মন্দিরে মানুষের ওজনে সোনাদানা ও অর্থ অর্ঘ্য হিসেবে দান করেন অনেক মানুষ। রাত নটা পর্যন্ত অচেনা জায়গায় আমরা কোথায় গেছি তার খোঁজে সংস্থার লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। ওরা তো অবাক হয়ে গেছে যে কীভাবে আমরা একা একা এমন দর্শন করতে পারলাম। তবে এখন আর অনুমতি পত্র আগাম নিয়ে যেতে হয় না, উপযুক্ত প্রমাণ ও অর্থের বিনিময়ে ওখানেই অনুমতি পাওয়া যায়। সেদিন রাতে ঘরেই খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো সেরে আমাদের রিজার্ভ করা বাসে উঠলাম এগমোরের উদ্দেশ্যে। দুটো বাস ভর্তি লোক ছিল। সকলেই পরিবারের সঙ্গে ছিল। ওখানে একটা চারতলা বিল্ডিং-এর হোটেলে আমরা যার যার ঘরে থাকলাম। ওদের নারকেল তেলের রান্না নিরামিষ খাবার খেয়ে রাতটা ওখানেই কাটালাম। পরের সকালে তিরুচিরাপল্লির কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পথে ইডলি-ধোসা-সাদা বড়া সহযোগে সকালের খাবার সারলাম। ওনারা বললেন কন্যাকুমারীর 'বিবেকানন্দ রক' দেখতে হলে প্রত্যেকের আলাদা টিকিট সকালেই লাইন দিয়ে কেটে নিতে হবে। তার সাথে লঞ্চের ভাড়া দিয়ে টিকিট রিজার্ভ করে নিতে হবে।

আবার আমরা ফিরে গিয়ে প্রত্যেকে আলাদাভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট জোগাড় করলাম। ফিরতে দেরির কারণে কোনোরকমে আমরা একটু খেয়ে সমুদ্রের পাড়ে রওনা দিলাম। আমাদের লঞ্চ বিকাল পাঁচটা নাগাদ। সারিবদ্ধভাবে লাইনে এগোতে থাকলাম। লঞ্চ কর্তৃপক্ষ আমাদের লাইফজ্যাকেট লাগাতে বলায় আমরা তা পরে লঞ্চে রকের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যেদিকে তাকাই দিগন্তবিস্তৃত শুধু সমুদ্র। আর হবেই না

কেন? ওখানে যে তিনটি সমুদ্র মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। বঙ্গোপসাগর, আরব সাগর আর ভারত মহাসাগর। কোনটার জল নীল, কোনটা সবুজ আবার কোনটা এলামাটি রঙের। আর এই বিশার সমুদ্রের মাঝে পাহাড় কেটে অতি মনোরম এই বিবেকানন্দ রক তৈরি হয়েছে। শোনা যায় দেবতার অভিশাপে রাজকন্যা অবিবাহিত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল। তাই তার পাথরের মূর্তি তৈরি করে রাখা আছে। আর শিবলিঙ্গ সহ স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির। ওখানে ঢুকে নীরবতা পালনের দ্বারা মন্ত্রযোগে ধ্যানে খুব অল্প সময় বসার অনুমতি পাওয়া যায়। তার পাশে আছে বিষ্ণু অবতারের মূর্তি। সবকিছু ছাপিয়ে রকের চারপাশ থেকে সমুদ্র দর্শনই যেন এক অবর্ণনীয় আকর্ষণ। সব কিছু দেখে আমরা প্রায় রাত্রি আটটা পর্যন্ত বসে রইলাম দর্শকদের বসার জায়গায়। আমরা যেখানে ছিলাম তার ডানদিকের রাস্তায় ছিল জেলেদের বস্তি। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পাকা বাড়ি তুলসিমঞ্চ সহযোগে আলপনা করা, পাশেই বঙ্গোপসাগর বয়ে চলেছে তার দৃষ্টিনন্দন রূপ নিয়ে। ওখানে দেখলাম বিদেশি পর্যটকরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপচারিতায় কাটালাম। পরের দিন ভোরবেলা বাসে উঠে রওনা হলাম পণ্ডিচেরি, মারিনা বীচ মিউজিয়াম, ইকোটুরিজম পার্ক দেখার উদ্দেশ্যে।

বাস কিছুটা দূর এগোবার পর আমরা পথে জলযোগ সারলাম। এবার প্রথমেই মারিনা বীচের সামনে বাস দাঁড়াতেই আমরা এক এক করে মারিনা বীচে নামলাম। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। বহু বিধি নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ। কিন্তু দেখে মনে প্রশান্তি হয়। এখানেই হয় তামিলদের বহু প্রচলিত ষাঁড়ের লড়াই। যাদের ষাঁড় লড়াই-এ জেতে তারাই হয় ক্ষমতাশালী। এখানেও ঘোড়ার পিঠে, উটের পিঠে চড়ার ব্যবস্থা আছে। বীচ থেকে উঠে এসে আমরা বিবেকানন্দ ভবনে উঠলাম। কারণ বিবেকানন্দ শিকাগো থেকে ফেরার পথে এইপথ দিয়েই ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। এখানেই তাঁর নাম নরেন্দ্র থেকে বিবেকানন্দ হয়েছিল। এখানকার রাজা তার নামে এই ভবনটি তৈরি করে এখানেই তাঁকে থাকতে বলেছিলেন। তিনি ছিলেনও কিছুদিন। এখানেই থ্রি ডি যোগে দ্বিতলে ওনার ধর্মপরিব্রাজকের ঘটনা দেখানো হয়। তারপর ঋষি অরবিন্দর আশ্রমে কাছাকাছি একটা হোটেলে রইলাম। আশ্রমের ভিতরে অনুমতিপত্র সহ ঘুরে দেখলাম। এটা পণ্ডিচেরিতে অবস্থিত। এখানকার সমুদ্র সৈকতও অতি মনোরম। পরেরদিন যথারীতি খুব ভোরবেলা উঠে আমরা ইকোট্যুরিজম পার্কে গেলাম। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ওখানে গেলে সূর্যঘড়ির সময় ও কম্পাসে দিক নির্ণয় এগুলো দেখা যায়। আমরা তো দেখলামই। এছাড়া নানারকমের গাছে ও ফুলে সমৃদ্ধ বাগান দেখে আনন্দিত হলাম। এবার আমরা রিজার্ভ বাসে রওনা দিলাম, মাদুরাই-এর উদ্দেশ্যে। এখানে বিকালে পৌঁছে সন্ধ্যায় আমরা মীনাক্ষি মন্দির দর্শনে এলাম। খুব সুন্দর সূক্ষ্ম কারুকার্যে ভরা মীনাক্ষি মন্দির। প্রধান ফটকটি বিশাল বড়ো সেখান থেকে ভিতরে ঢুকে আবার ছোটো গলির মতো গেট দিয়ে মন্দির দর্শনে প্রবেশ করতে হয়। এছড়াও রয়েছে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন মন্দির। এই দেবীও খুবই সমৃদ্ধশালিনী। গুনে শেষ করা যাবে না তার অর্থভাণ্ডার। মন্দিরের চারদিকে চারটি একরকম কৌশলে নির্মিত প্রবেশদ্বার। সুতরাং যে প্রবেশদ্বার দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেছি, নির্দিষ্ট সেই পথেই আবার ফিরে না এলে নিজের গন্তব্যস্থলে আর ফিরে আসা যাবে না। অন্য অঞ্চলে চলে যেতে হবে। এখানে আরও অনেক মন্দির আছে সেগুলো আমরা আর না দেখে এবার রওনা দিলাম মহীশূরের উদ্দেশ্যে। এখানে মাইশোর প্যালেসের কাছাকাছি আমরা একটা হোটেলে থেকে প্যালেস দেখলাম। সেখানে এখনও হাতিশালে

হাতি ও ঘোড়াশালে ঘোড়া রাখা আছে এবং পর্যটকদের জন্য তাতে চড়ে প্যালেস ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে। প্যালেসের পিছন দিকে শেষ বংশধরেরা এখন বসবাস করছে। কিন্তু সেখানে প্রবেশ করার অনুমতি নেই কারোর। আমরা হাতির পিঠে চড়ে ভ্রমণ করেছিলাম। কাছেই ছিল অঞ্চলের উৎপন্ন জিনিসের ও মাইশোরের ইতিহাস সমৃদ্ধ মিউজিয়াম। এবার আমরা রওনা দিলাম কোয়েম্বাটুরের পথে, ঝকঝকে রাস্তাঘাট, দুপাশে রাস্তার নাম লেখা আর আছে বড়ো বড়ো তেঁতুল গাছ। গাছ ভর্তি তেঁতুল ঝুলে আছে, কিন্তু কেই সেই গাছের ফলে হাত দিতে পারবে না। সবটাই সরকারি তত্ত্বাবধানে থাকে। সরকারের এটা অর্থকরী ফসল। পথে নেমে আমরা ওয়াশরুমের কাজকর্ম সেরে একটা মন্দিরের চাতালে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে আবার রওনা দিলাম সেই বিখ্যাত ফরেস্ট বান্দার (চন্দন দস্যু) ভিতর দিয়ে একদম নীরবে হু হু করে বেরিয়ে পড়লাম উটির উদ্দেশ্যে। আমরা সন্ধের মধ্যে একটা হোটেলে উঠলাম। সেখানে কলাভাজা সহযোগে গরম কফি পান করে আমাদের ক্লান্তি দূর করলাম। কাছেই ছিল পাহাড়ের গায়ে বাজার ও লাইন দিয়ে নানারকমের চকোলেটের দোকান। আমরা একটু দাম বুঝে নিলাম। পরের দিন বাড়ির জন্য চকোলেট কিনলাম। কাছাকাছি ছিল একট মনোরম পার্ক, ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বাকিরা দূরে ইকোট্যুরিজম পার্কে ঘুরতে চলে গেল নিজস্ব খরচে। ওখানে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীদের বাংলো বাড়ি আছে। এছাড়া হোটেলের পিছনদিকে চা ও কফি তৈরির কারখানা। আমরা তার ভিতরে প্রবেশ করে চা তৈরির পদ্ধতি চাক্ষুস করলাম। এবার আমরা রামেশ্বরমের দিকে রওনা দিলাম। ওর কাছাকাছি কাঞ্জিপূরমে পাথরের শিল্প এবং কাঞ্জিভরম শাড়ির দোকান দেখলাম। তারপরে রামেশ্বরমে বিরাট শিবলিঙ্গের মূর্তি দর্শন করলাম এবং প্যাড়া প্রসাদ ক্রয় করলাম। সবচেয়ে দর্শনীয় হল ওই সমুদ্রের জলের উপরে অস্থায়ী সেতুর উপর দিয়ে ট্রেন চলা। ট্রেন চলে গেলে আবার সেতু উঠে যায়। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত অতি সুন্দর। তখন জলরাশি নানারঙে ঝিলমিল করতে থাকে।

এবার আমাদের ঘরে ফেরার পালা। একটু আগে আগে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে আমরা যশোবন্তপুর স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমাদের সময় ছিল না বলে গাড়ি থামালো স্টেশনের পিছনদিকে। ব্যবস্থাপক দুজন আগে নেমে স্টেশনে উঠে গিয়ে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে দাঁড়ালো আর বাকিরা সকলের নাম লেখা লাগেজগুলি নীচের থেকে তুলে দিল। আমরা একটু হেঁটে স্টেশনে উঠলাম। তারাই আমাদের কামরায় লাগেজগুলি পৌঁছে দিল। ট্রেনে বসেই আমরা চা ও কিছু স্ন্যাক্স খেয়ে নিলাম। আর সাথে সাথে দক্ষিণ ভারতকে বিদায় জানিয়ে হাওড়ায় উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। যেখানেই গেছি আমি আর উমা কিন্তু সর্বদা একসাথে থেকেছি। অত্যান্ত চিত্তাকর্ষক এই ভ্রমণ আমৃত্যু স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর একবার কৃতজ্ঞতা জানাবো আমাদের স্নেহের উমাকে।

১ এপ্রিল থেকে ২০২৪ - ২০২৫ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ

তপনকুমার দাস

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গান 'নিগ্রো ভাই আমার পলরব্সন ওঁরা ভয় পেয়েছে।' সত্যি ওঁরা ভয় পেয়েছে চিকিৎসক সহ আমজনতার প্রতিবাদে। সবার একটাই দাবি সঠিকভাবে বিচার করুন, তদন্ত যেন কোনোভাবে প্রভাবিত না হয়, জনতা বলছে এর আমরা শেষ দেখে ছাড়বো। আর জি কর হাসপাতালের ভেতরে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে সারাবিশ্ব এক হয়েছে তার প্রমাণ ১৪ আগস্ট এর রাত। রাত যত গভীর হচ্ছে আন্দোলনের আওয়াজে প্রখর রোদের তাপে আলোকিত করেছে।

ঘটনাক্রমে ১৯৪২ এর ৯ আগস্ট ভারতছাড়ো আন্দোলন হয়েছিল, সেই গভীর রাতেই 'মা অভয়া'কে নির্মম পাশবিক অত্যাচার করে ওরা খুন করেছে। এর প্রতিবাদে আজ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস-কে চূর্ণবিচূর্ণ করে ১৪ আগস্ট রাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েত এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সবার এক আওয়াজ ৮ থেকে ৮০ বিচার চাই, বিচার চাই।

যেখানে পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ জুড়ে নারীরা কাজ করে চলেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সেই প্রগতির ক্ষেত্রকে আটকাতে চাইছে এই রাজ্য সরকার। সম্প্রতি ফ্রান্সে যে ৩২তম অলিম্পিকের আসর বসেছিল, সেখানে ১৫,০০০ প্রতিযোগীরা মধ্যে অর্ধেক নারী। অলিম্পিকের শেষ অনুষ্ঠানের ভারতের পতাকাবাহী ব্রোঞ্জ অধিকারী 'মানু'। সুতরাং একবিংশ শতাব্দীতে নারীর ডিউটি নিয়ে রাজ্য সরকার মহিলাদের রাতের ডিউটি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার মতো লজ্জাজনক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছে। একই সঙ্গে 'রাতে মহিলাদের ডিউটি করার সময় যাতে জোড়ায় জোড়ায় রেখে কাজ করানো যায়' সেই প্রস্তাব রাজ্য সরকার বিবেচনায় রাখবে বলে ঘোষণা করছে রাজ্য প্রশাসন। সরকারের এসব সিদ্ধান্তকে ধিক্কার জানাচ্ছে সমগ্র বাংলাবাসী। পৃথিবী যখন এগোচ্ছে তখন এই সরকার "মনুবাদী" সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় আশাকর্মীদের রাতের কাজ সম্পর্কে। গ্রাম বাংলায় যখন রাতে প্রসূতিদের কোনো সমস্যা হয় তখন এই আশাকর্মীরাই ছুটে যায়। "একটা মেয়ে হাসপাতালের মধ্যেই খুন হয়ে গেল, সরকার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছে না। উলটে মেয়েদের বলছে, তোমরা ঘরে ফিরে যাও। এটাতো আর এস এস বলে, মেয়েদের বাইরে কাজ করার দরকার নেই। রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরকে জুড়ে 'রাত্তিরের সাথী' নাম দিয়ে এক প্রকল্পের ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সরকার বলছে 'মহিলাদের রাতের ডিউটি থেকে যতদূর সম্ভব অব্যাহতি দেওয়ার চেষ্টা হবে'। সরকারের এই প্রস্তাবে বরং অন্য বিপদের আশঙ্কা করছেন মহিলারা। তাঁদের বক্তব্য, 'এর পর রাতে কোনো ঘটনা ঘটলে, মেয়েদেরই সবাই দোষ দিতে চাইবে'। যে সকল মেয়েরা এম.এন.সি.তে চাকরি করে, তার সিংহভাগ মেয়েরাই। দুঃখ হয় এই সরকার ব্যর্থ আর ব্যর্থ। স্বাধীনতার ৭৮ বছরে, একবিংশ

শতাব্দীতে এই ধরনের কথা সরকার কী করে বলতে পারে?

আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট বলছে, শহুরে মেয়েদের ১৭% বেতনভুক শ্রমশক্তির অংশ, গ্রামীণ মেয়েদের অবস্থা আরও খারাপ। তাঁরা দুষ্টচক্রের শিকার— কৃষি থেকে গৃহস্থালি থেকে পরিবার, অবৈতনিক শ্রম হতমান করেছে। সবেতন কাজ বা উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে যেখানে পৌছানোর দাবিও নিরুৎসাহ করা হয়, যার মুখ্য কারণ সুরক্ষার অভাব।

নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রশ্নটিই আবার অনেক সময়ে তাঁদের বন্দি রাখার সঙ্গে সমতুল হয়ে যায়। রাতের কাজ অথবা বিপজ্জনক বা শ্রমসাধ্য বা 'নৈতিকভাবে অনুপযুক্ত' কাজে তাঁরা থাকতে পারবেন কিনা, সে সংক্রান্ত বিধিনিষেধে গোলকধাঁধা রয়েছে। এর ফলে সামাজিকভাবে উপরে ওঠার সুযোগটিও বন্ধ হয়ে যায়। শীর্ষনেত্রী হওয়ার অর্থ, তাঁকে সব রকমের বাধা ভাঙতে হয় এবং বারংবার শান্ত থাকার পরামর্শ শুনতে হয়, যে কথা গোপীনাও বলেছেন।

আমাদের স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা বাংলাকে আমরা দুষ্কৃতিদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠতে দিতে পারি না। দুর্বৃত্তদের কঠোর হুঁশিয়ারি দিতে প্রয়োজন 'অভয়া' কাণ্ডে জড়িত সকলের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। দায়িত্বের সাথে জড়িয়ে থাকা বিশেষ করে তদন্তকে প্রভাবিত করতে চাওয়া কাউকেই বেনিফিট অব ডাউট দেওয়া চলবে না। মানুষের লড়াই, মাথা তুলে বাঁচার লড়াই, গ্রাম, শহর, নগর, বন্দরে সর্বত্র এই লড়াইয়ে জ্বলুক চেতনার মশাল।

শাস্তি চাই, শাস্তি চাই এই হোক আমজনতার আওয়াজ।

ট্রিগার ফিঙ্গার এর আকুপাংচার চিকিৎসা

ডা. সন্দীপ সেনগুপ্ত

বলরামবাবুকে দিয়েই শুরু করা যাক। গত সপ্তাহে ক্লিনিকে ঢুকেই বলরামবাবু আমার মুখের সামনে ঘুষি পাকিয়ে দেখালেন। না না, ভুল বুঝবেন না। আমারে নাকে মুষ্ঠাঘাত করার উদ্দেশ্যে নয়, উনি ঘুষি দেখালেন এটা বোঝাতে যে এখন তিনি হাত পুরোপুরি মুঠো করতে পারছেন। আসলে সবটা খোলসা করে না বললে পুরো ব্যাপারটা বোঝা যাবে না। বলরামবাবু মাস খানেক ধরে একটা সমস্যায় ভুগছিলেন। হাতের মধ্য আঙুলটি ভাঁজ করতে পারছিলেন না। যদি বা জোর করে মুঠো পাকান, তো আঙুল ওই অবস্থাতেই আটকে যাচ্ছিল। আঙুল খুলতে গিয়ে জীবন বেরিয়ে যাওয়ার সামিল হচ্ছিল। এই অবস্থায় ওঁর আকুপাংচার চিকিৎসা শুরু হয়। হাতে গোটা তিনেক সূচ ফুটিয়ে মৃদু মাত্রার ইলেক্ট্রিক স্টিমুলেশন দেওয়া হল। খান পাঁচেক সিটিং এর পরই বলরামবাবু অনেকটা ভালো বোধ করছেন। আঙুল আটকে যাওয়া অনেক কম, মুঠোও পাকাতে পারছেন সহজে। মুঠো পাকানোর পরের ঘটনা তো আগেই বলেছি।

এই যে আঙুল ভাঁজ করতে গিয়ে আটকে যাওয়া, সহজে খুলতে না পারা, এই লক্ষণগুলো যে

রোগে দেখা যায় তার নাম ট্রিগার ফিঙ্গার। যদিও মধ্যবয়স্কা মহিলাদের এই রোগটি বেশি হয়, তা বলে পুরুষরাও কিন্তু পার পায় না। রোগটির মূল লক্ষণ হল আঙুলের সাহায্যে কোনো কাজ করার সময় আঙুল আটকে যাওয়া বা লক হয়ে যাওয়া। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে রোগী অন্য হাতের সাহায্যে জোর প্রয়োগ করে আঙুলটিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরায়। এই লক হয়ে যাওয়া সাধারণত হয়— কাপড় কাচার সময়, কাপড় নিঙড়াবার সময় বা শক্ত করে গ্লাস ধরার সময় অথবা অন্য যে কোনো সময়। হাতের তালুতে, রোগগ্রস্ত আঙুলটার গোড়ায় কেটা শক্ত গুটি তৈরি হয়। এটায় চাপ দিলে ব্যথা লাগে।

পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, ট্রিগার ফিঙ্গার রোগটা কেন হয় আর এমন অদ্ভুত নামই বা কেন?— সাধারণত যারা আঙুলের সাহায্যে একটানা এবং অতিরিক্ত কাজ করেন, তারাই এই রোগে বেশি আক্রান্ত হন। কম্পিউটার, টাইপ রাইটার, পিয়ানো ব্যবহারকারীদের মধ্যে এটি হবার প্রবণতা বেশি। তেমনি যাদের আঙুলের জোর প্রয়োগ করে কাজ করতে হয়,যেমন বাস ড্রাইভার, বা মেকানিক... তারাও এটির শিকার হতে পারেন।

অল্প কিছু ক্ষেত্রে চোট আঘাতের দরুনও রোগটা হতে পারে। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই কোনো নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এবার আসি নামে— এই রোগে হাতের আঙুল লক হবার সময় বা তাকে খুলতে গেলে বন্দুকের ট্রিগার টেপার সময় যেমন খটাস করে আওয়াজ হয় তেমনটাই শোনায়। তাই এটার নাম ট্রিগার ফিঙ্গার।

হাতের আঙুলগুলোকে ভাঁজ করতে সাহায্য করে ফ্লেক্সর মাসলের টেন্ডন। এগুলো ফাবির দ্বারা আবৃত থাকে। অনেক সময় আঙুলের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ফাইবার আবরণী আঙুলের গোড়ার দিকে ফুলে ওঠে। শুধু তা নিয়, ফ্লেক্সর টেন্ডনের কাছের অংশ ক্ষয়ে যায় এবং দূরের অংশ মোটা হয়ে যায়। এর ফলে ফুলে যাওয়া ফাইবারের মধ্যে দিয়ে ফ্লেক্সর টেন্ডন আঙুলকে সহজে ভাঁজ করা এবং খোলার কাজটা করতে পারে না। আর তারই ফলে আঙুল লক হয়ে যায়।

আকুপাংচার চিকিৎসা—

রোগটার প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারলে সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব। আর দেরি করলে রোগটা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। তখন সার্জিকাল অপারেশন ছাড়া উপায় থাকে না। যাই হোক, এই রোগের আকুপাংচার চিকিৎসা সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যাক। আকুপাংচার চিকিৎসায় সবার আগে রোগের প্রকৃতি অনুযায়ী বিন্দু নির্বাচন করা হয়। এর পর খুব সূক্ষ্ম দুই তিনটে স্টেইনলেস স্টিলের সূচকে উপযুক্তভাবে জীবানুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। এবার রোগগ্রস্ত হাতের নির্দিষ্ট কয়েকটা পয়েন্টে ওই সূচগুলো ফোটানো হয়। সূচ ফোটানো শুনে খুব ব্যথাদায়ক বা ভয়ঙ্কর মনে হলেও, সাধারণ পিঁপড়ে কামড়ানোর চেয়ে বেশি কিছু অনুভূত হয় না। যাই হোক এর পর ওই সূচগুলো মিনিট কুড়ি ফুটিয়ে রাখা হয়। ট্রিগার ফিঙ্গার এর বেশিরভাগ রোগীকেই মৃদু ইলেক্ট্রিক স্টিমুলেশনও দেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে মক্সার (এক ধরনের পাহাড়ি ভেষজ) গরম সেঁকও দেওয়া হয়। আকুপাংচারে বাইরে থেকে কোনো ওষুধপ্রয়োগ করা হয় না। শরীরের মধ্যে থাকা বিভিন্ন হরমোন, উৎসেচক ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে শরীরের রোগ নিরাময় করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা

Vol : XIV Issue : VII, 15th, October, PRABINBARTA Postal Regd. NO.-KOL RMS/449/2022-24

যায় অল্প কিছু সিটিং এর মধ্যেই ট্রিগার ফিঙ্গার এর রোগী ভালো পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারছেন। আঙুল ভাঁজ করা এবং খোলা সহজ হচ্ছে।

রোগটার প্রাথমিক পর্যায়ে আকুপাংচার চিকিৎসা শুরু করতে পারলে একদিকে যেমন অতি দ্রুত সুস্থ হওয়া সম্ভব, অন্য দিকে তেমনই পাঁচরকম অনর্থক চিকিৎসায় অর্থনাশও আটকানো সম্ভব।

সুকান্ত স্মরণ

মৃনাল দত্ত

এখনও চিত্তে তোমার রৌদ্রময় উপস্থিতি
এখনও শহরের রাজপথে
উজ্জ্বল মিছিলে
তোমার কবিতার দৃপ্ত উচ্চারণ।

তোমার স্বদেশে লুটেরার নিলাজ চেহারা
বিবমিষায় ভরে যায় মুখ গহ্বর
কণ্ঠনালীতে ওঠে আসে অশ্লীল শব্দ...
তুমি তো বোধন করেছে
অক্ষরে অক্ষরে বিদ্রোহ বিপ্লব

আজ অন্ধ আকাশ তোমার কবিতা
স্বপ্নহারা আমাদের চিত্তে দিক
কাস্তের ফসল ফলানো তীক্ষ্ণতা
জীবনের শৃঙ্খলভীন সংকেত।
'সুকান্ত' উচ্চারণে জেগে ওঠুক
সমাজ বদলের স্বপ্নিল বিবেক।

জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র
বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন
৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২
বাস ষ্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী ঃ কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা ১০টাকা (প্রতিবার)

১) ডা. উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক) ২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধে ৬টা
২) ডা. মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - বুধবার সন্ধে ৬টা
৩) ডা. কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল মেডিসিন) - মঙ্গলবার বিকেল ৫টা
৪) ডা. সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও (গাইনোকলজিস্ট) - বুধবার সন্ধে ৭টা
৫) ডা. সৌম্য চ্যাটার্জি - এম.ডি. (নিউরো- সাইকিয়া-ট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধে ৮টা
৬) ছন্দলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধে ৭টা
৭) অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট) সোম ও বৃহঃ সন্ধে ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি
সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা
যোগাযোগ ঃ ২৪২৫-৪৪৫৪

Published by Goutam Roychowdhury on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Goutam Roychowdhury.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in